যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি এখানে যথেষ্টই লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষাগত মানও (Educational Standard) এখানে যথেষ্ট উন্নত। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দলের ভূমিকাও এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়া ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের মাত্রাও এখানে যথেষ্ট উন্নত। ফলে সমাজ-অর্থনৈতিক কাঠামোকে রাষ্ট্রব্যবস্থার রাজনৈতিক সংস্কৃতি গঠনে একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসাবেই কাজ করতে দেখা যায়।

এ ছাড়া রাষ্ট্রব্যবস্থার শ্রেণিচরিত্র (Class-character), উপগোষ্ঠীর (Sub-groups) কার্যকলাপ, রাজনৈতিক মতাদর্শ (Political Ideology) প্রভৃতি বিষয়ও হল রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপাদান।

উদাহরণ হিসাবে দেখানো যেতে পারে যে, রাশিয়া ও আমেরিকা—উভয় রাষ্ট্রেই শ্রমজীবী শ্রেণি আছে। কিন্তু একথা বলা হয়ে থাকে যে, আমেরিকার শ্রমজীবী শ্রেণিকে বুর্জোয়া শ্রেণির ভাবাদর্শে বিশ্বস্ত করে তোলা হয়েছে এবং পুঁজিবাদের (Capitalism) প্রতি এই শ্রেণিকে অনুগতও করে তোলা হয়েছে। বলাই বাহুল্য, পুঁজিবাদী আমেরিকার শ্রমজীবী শ্রেণির এই শ্রেণি-চরিত্র সমাজবাদী রাশিয়ার শ্রমজীবী শ্রেণির ক্ষেত্রে কোনো ক্রমেই প্রযোজ্য নয়। কারণ রাশিয়ার শ্রমজীবী শ্রেণি মোটেই পুঁজিবাদে বিশ্বস্ত নয়, বরং বিশ্বস্ত সমাজবাদেই। ফলে আমেরিকা ও রাশিয়ার রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য থাকাটাই স্বাভাবিক। আবার রাজনৈতিক মতাদর্শগত দিক থেকে আমেরিকায় গণতন্ত্র (Democracy) এবং রাশিয়ায় সমাজবাদ (Socialism) প্রচলিত থাকায় এই দুটি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি হল স্পষ্টতই পৃথক।

এইরকমভাবে কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থার রাজনৈতিক সংস্কৃতি বেশ কিছু উৎস বা উপাদানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে।

✦ **মন্তব্য** : সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রাজনৈতিক সংস্কৃতি গঠনের পশ্চাতে সমাজ-অর্থনৈতিক কাঠামো, রাজনৈতিক মতাদর্শ (ideology), জাতিগত চরিত্র, ঐতিহাসিক পটভূমি, ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের মতো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে। এই উপাদানগুলি হল আবার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত; এদের কোনোটি ছাড়া অপর কোনোটি সক্রিয় থাকতে পারে না। কারণ, বিশেষ ঐতিহাসিক পটভূমির জন্য বিশেষ অর্থনীতি গড়ে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শও। আমেরিকা ও রাশিয়ার ঐতিহাসিক বিকাশের বৈচিত্র্যের কারণেই এদের রাজনৈতিক মতাদর্শ ও অর্থনীতির চরিত্রও ভিন্ন হয়ে দাঁড়ায়। ফলে এদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রকৃতিও ভিন্ন হয়ে পড়ে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, রাজনৈতিক সংস্কৃতি হল পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন উপাদানের ফলশ্রুতি স্বরূপ।

8.5. রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক (Aspects of Political culture) :

সূচনা ঃ রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে বিশ্লেষণ করার দুটি দিক বা উপাদান আছে। এই দিক দুটি হল—(১) রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি জনগণের আনুগত্যের মনোভাব এবং (২) সিদ্ধান্তরচনাকারী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ সম্পর্কে জনগণের চেতনা। স্বীকার করতেই হবে যে, এই দুটি দিকই হল আবার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রকৃতি নির্ধারণে এই দিক দুটি তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি ...

SHOT ON REDMI K20
AI TRIPLE CAMERA

তাকে বৈদেশিক আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করেছে। ফলে এখানকার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বহিরাক্রমন সম্পর্কে কোনো ভীতির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না। আবার পূর্বতন পশ্চিম জার্মানের (West German) অবস্থিতি রাশিয়া ও আমেরিকা পরিচালিত দুই প্রতিদ্বন্দ্বী আন্তর্জাতিক সামরিক জোটের মধ্যস্থলে থাকার কারণেই পশ্চিম জার্মানবাসীগণ বিদ্যমান যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতান্ত্রিক কাঠামোকে সমর্থন করেন বলে মনে হয়, কারণ তা না করলে পশ্চিম জার্মানের রাজনীতিতে যদি কোনো অস্থায়িত্ব দেখা দেয় তাহলে তা বাড়তি আন্তর্জাতিক উত্তেজনাতেই পরিণত হবে।

(৩) **জাতিগত বৈষম্য (Ethnic Differences)** হল রাজনৈতিক সংস্কৃতি গঠনের উপর একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান। তবে রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপর এই উপাদানটির প্রভাব বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। বহুভাষাভাষী জনগণ (Polyglot Population) আমেরিকাতে বসবাস করলেও আমেরিকা কিন্তু প্রচুর সংখ্যক অভিবাসীর, অন্তত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অভিবাসীদের (Immigrants) একত্রিত করার ক্ষেত্রে সফল হয়েছে। ফলে বিভিন্ন জাতিগত গোষ্ঠী নিজেদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকারী মার্কিন গোষ্ঠী হিসেবেই গণ্য করে থাকে। অথচ দক্ষিণ আফ্রিকা (South Africa) ও কানাডার (Canada) ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বিভিন্ন জাতিগতগোষ্ঠী তাদের নিজেদের ভাষাকে বজায় রেখেছে এবং জাতিগত গোষ্ঠী (Ethnic Group) ও ধর্মের (Religion) মধ্যে সংযোগ রক্ষা করেই নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

তবে এমনও হতে পারে যে, জাতিগত গোষ্ঠীগুলির সদস্যগণ জাতীয় সরকারের প্রতি আনুগত্য না দেখিয়ে সেই আনুগত্যকে যদি নিজেদের গোষ্ঠীগুলির প্রতি দেখায়, তাহলে রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্থিতিহীনতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। আর এই স্থিতিহীনতা ও বিশৃঙ্খলা আরও বেশি সুনিশ্চিত হয়ে উঠবে যদি সেই আনুগত্যকে অপর কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি প্রদর্শন করা হয়। তাইতো দেখা যায় যে হ্যাপ্সবার্গ সাম্রাজ্যে (Hapsbarg Empire) সার্বগণের বা অস্ট্রীয়গণের (Serbians) এবং চেকোশ্লোভাকিয়া রাষ্ট্রব্যবস্থায় জার্মানগণের অন্তর্ভুক্তিই ছিল ১৯১৪ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত সময়ের যাবতীয় ইউরোপীয় যুদ্ধ বা বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

(৪) রাজনৈতিক সংস্কৃতি গঠনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল **সমাজ-অর্থনৈতিক কাঠামো (Socio-Economic Structure)**। রাষ্ট্রব্যবস্থার রাজনৈতিক সংস্কৃতি তার নিজের সমাজ-অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিপ্রকৃতির উপর নির্ভর করে। এই কারণেই উন্নয়নশীল রাষ্ট্রব্যবস্থা ও উন্নত রাষ্ট্রব্যবস্থাগুলির রাজনৈতিক সংস্কৃতি সমজাতীয় নয়। এমনকি উন্নত রাষ্ট্রব্যবস্থার অর্থনৈতিক প্রগতি চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছে গেছে বলেই উন্নয়নশীল বা অনুন্নত রাষ্ট্রব্যবস্থায় যাকে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলে মনে করা হয়, তা এখানে অর্থাৎ উন্নত রাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে উপেক্ষিত হয়েই থাকে। উন্নত রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাত্রা ব্যাপক এবং গোষ্ঠীরাজনীতির প্রভাব যথেষ্টই প্রবল। কিন্তু অনুন্নত রাষ্ট্রগুলিতে নতুনত্ব প্রবর্তনের কোনো প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় না। তাছাড়া এখানে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাত্রাও উল্লেখযোগ্য নয় এবং পরিবর্তন সাধনের কোনো প্রবণতাও এখানে দেখা যায় না।

প্রকৃত প্রস্তাবে, কৃষিভিত্তিক সমাজে যেখানে কৃষকরাই জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সেখানে রাজনৈতিক মূল্যবোধগুলি সাধারণত রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন এবং পরিবর্তনবিমুখ হয়ে থাকে। তা ছাড়া এখানে সরকারি কার্যকলাপের প্রতি জনগণের খুব একটা আগ্রহ থাকে না। এখানে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় প্রশাসন (Central Administration) কী কী কাজ সম্পাদন করে তারই উপর শুধুমাত্র গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু সরকারি নীতিগুলি কেমনভাবে পরিচালিত ও কার্যকর হয় সেই বিষয়ে কোনো চেতনাই এখানে থাকে না। অন্যদিকে শিল্পোন্নত ও নগরকেন্দ্রিক সমাজ হল নিঃসন্দেহে একটি জটিলতর সমাজ;

SHOT ON REDMI K20
AI TRIPLE CAMERA

পারে। তবে এই সং...

উদ্বুদ্ধ করে রাষ্ট্রীয় সুস্থিতি বজায় রাখা—তা বলাই বাহুল্য।

8.4. রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভিত্তি (Foundation of Political Culture) :

সূচনা ঃ রাজনৈতিক সংস্কৃতি সমজাতীয় বা অসমজাতীয়, অংশগ্রহণমূলক বা শর্তাধীন বা নিষ্ক্রিয়, অভিজাততান্ত্রিক বা সাধারণ—যে প্রকারেরই হোক না কেন তবু মনে রাখতেই হবে যে, এই সংস্কৃতি কিন্তু কোন মতেই রাষ্ট্রব্যবস্থার কোনো একটি বিশেষ উপাদানের ফলশ্রুতি নয়, বরং তা সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বেশ কিছু উপাদানেরই চূড়ান্ত ফসল। এই উপাদানগুলি হল ঐতিহাসিক উন্নয়ন, ভৌগোলিক অবস্থান, সমাজ-অর্থনৈতিক কাঠামো, ধর্মীয় আচার-আচরণ ইত্যাদি। এই উপাদানগুলিকে নিয়েই আমরা এবার আলোচনা করব।

(১) **ঐতিহাসিক বিকাশ বা উন্নয়ন (Historical Development)** হল রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। একথা ঠিক যে, রাষ্ট্রব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিকাশের পটভূমিকাকে উপেক্ষা করে কোনো রাজনৈতিক সংস্কৃতিই গড়ে উঠতে পারে না। আমেরিকা, এক সময়ে দীর্ঘকাল ধরে ব্রিটেনের অধীন এলাকা বা উপনিবেশ ছিল বলে সেখানে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যে রাজনৈতিক ধ্যানধারণা গড়ে উঠেছিল, তারই জন্য আমেরিকায় স্বাধীনতা সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল। আর এই সংগ্রামের লক্ষ্যই ছিল ব্রিটেনের সঙ্গে রাজনৈতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা। যদিও এই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রাজনৈতিক বিশ্বাসের ফলে অতীতকে অস্বীকার করা হয়নি, তবুও কিন্তু এরই ফলে আমেরিকায় বেশ কিছু উদার গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এসব রীতিনীতি ও পদ্ধতিকে পরবর্তীকালে মার্কিন সংবিধান দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছিল। এভাবেই আমেরিকাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নয়া সমতাপ্রধান ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মূল্যবোধগুলির (New Egalitarian and Competitive Values) উপর নির্ভরশীল এক স্থায়ী রাষ্ট্রব্যবস্থা। এবং আমেরিকার সাম্প্রতিক শিল্পায়ন ও গণ-অভিবাসন (Mass-immigration) বা বিপুল সংখ্যক বহিরাগত বা বিদেশির আগমন ও বসবাস সত্ত্বেও উক্ত মূল্যবোধগুলির কোনোও মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। বলাই বাহুল্য, অতীতের প্রতি স্বীকৃতিই হল এর প্রধান কারণ। আবার এশিয়া (Asia) ও আফ্রিকার (Africa) রাষ্ট্রব্যবস্থাগুলির রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তাদের উপর আরোপিত সুদীর্ঘকালের ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি তারা যে মানসিক প্রতিক্রিয়া করেছিল তার ফলশ্রুতি হিসাবেই। তাই দেখা যায় যে, স্বাধীনতা লাভের পরেও ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ওয়েস্টমিনিস্টার ধাঁচের যে সংসদীয় সরকার (Parliamentary Government) প্রচলিত আছে, তা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনেরই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব, সন্দেহ নেই।

(২) ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ব্যতীত **ভৌগোলিক অবস্থিতিও** (Geographical Location) রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ব্রিটেনের দ্বীপবেষ্টিত ভৌগোলিক অবস্থিতিই

SHOT ON REDMI K20